তোমার দেওয়া আমার কোনো নাম ছিল না

আমিনুল ইসলাম

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

উৎসর্গ

দুজন মানুষকে—

যাদের নাম আমি লিখতে চাই না। তাদের নিয়েও কিছু বলতে চাই না। এমনকি এটাও চাই না যে, তারা এই উৎসর্গ পত্র দেখুক। ভালো থাকুক প্রিয় দুজন মানুষ।

লেখকের কথা

এ বইটির প্লট সময় নিয়েছে আমার প্রথম বই বাটারফ্লাই ইফেক্ট-এর কিছু আগে। বাটারফ্লাই ইফেক্ট-এর অন্যতম প্রধান চরিত্র অর্ক এ বইয়ে থাকলেও এ বইটি পড়ার জন্য বাটারফ্লাই ইফেক্ট পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আশা করছি পাঠকদের বইটি ভালো লাগবে আর পাঠক বইটি পড়ে আলোচনা করে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করবে।

তোমার দেওয়া আমার কোনো নাম ছিল না

০০০

জমশেদপুর, রাত চারটা ত্রিশ...

অন্ধকার নির্জন পিচঢালা সড়কটা চলে গেছে বহুদূর। দিনের বেলা ব্যস্ত থাকলেও পিচঢালা রাস্তার নির্জন রাতের একমাত্র সঙ্গী নিজেদের মাঝে একটু দূরত্ব রেখে পাশে পাশে দাঁড়ানো একাকী ল্যাম্পপোস্টগুলো। সেগুলো থেকে আসা সোডিয়ামের আলোয় মনে হচ্ছে বহুকাল আগে কোনো একসময় পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে মানুষ, শুধু পড়ে আছে তাদের বানানো এই সড়ক। প্রাচীন কালের মানুষের অস্তিত্ব প্রমাণ দিতেই এখনো সড়কটি টিকে আছে। এই ধারণা ভুল প্রমাণ করতেই হয়তো সাদা রঙের একটি পিকাপ ট্রাক ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো রাস্তাটা ধরে। এসে থামল একটা ল্যাম্পপোস্টের নিচে।

ড্রাইভারের দরজা খুলে গেল। সেখান থেকে নামে কেউ একজন, তার পরনে কালো রঙের হুডি। মাথা আর মুখের বেশিরভাগটাই ঢাকা, পুরুষ-মহিলা কিংবা বয়স কিছুই বোঝা যাচ্ছে না দূর থেকে। মানুষটি পায়ে পায়ে হেঁটে যায় ট্রাকের পেছনের দিকে, দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকে যায়। বিশ সেকেন্ড পরই আবার দেখা যায় তাকে, কাঁধে সাদা ভারী কিছু, একটা বস্তা! যার ভারে নুইয়ে পড়েছে অনেকটা। হুডি পরা মানুষটি বস্তা কাঁধে সড়কের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, সড়কের পাশে জঙ্গলের মতো নিরিবিলি একটা জায়গা, নীরবতার চাদরে ঢেকে আছে পুরো জঙ্গল। ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকার শব্দ পর্যন্ত

নেই। একবারের জন্যও সংকোচ না করে কাঁধে বয়ে নেওয়া ভারী বস্তাটা ফেলে দেয়, ধপ করে একটা শব্দ হলো। ডানে বায়ে একবার তাকাল মানুষটি, সম্ভবত কেউ কিছু দেখেছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হচ্ছে। কেউ দেখা তো দূর আশপাশে একটি কুকুরও নেই। হুডি পরা মানুষটি গিয়ে তার ট্রাকে ওঠে, ট্রাকটা আবার চলতে শুরু করে সড়ক ধরে, এগিয়ে গিয়ে একসময় হারিয়েও যায়।

বস্তাটা পড়ে আছে, বস্তার খোলা মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে নগ্ন দুটো পা। ভালো করে লক্ষ করলে রাস্তা থেকেই বস্তাটা, আর তা থেকে বেরিয়ে আসা পা দুটো চোখে পড়বে।

কিছুক্ষণ পার হয়ে গেল। দূরে কোথাও থেকে ভেসে এলো আজানের মিষ্ট ধ্বনি। একজন বৃদ্ধ মানুষকে দেখা গেল সাদা পাঞ্জাবি আর টুপি পরনে। দ্রুত পায়ে বস্তাটার একদম পাশেই ফুটপাত ধরে হেঁটে আজানের শব্দটা যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই হেঁটে যাচ্ছেন। তিনি খেয়ালও করলেন না ফেলে রাখা বস্তাটা।

ভোরের আলো ফুটতে শুরু করছে, অন্ধকার হারিয়ে যাচ্ছে। রাস্তা ধরে একটি লম্বাটে সাইকেল আসতে দেখা গেল। বাড়ি বাড়ি পত্রিকা ডেলিভারি দেয় সাইকেলের মালিক। বস্তাটার পাশ ঘেঁষেই যাওয়ার সময় সেটা তার নজর এড়াল না। কিছুদূর গিয়ে ব্রেক কষল। কৌতূহলী মনে ধীর পায়ে এগিয়ে আসতে শুরু করল লোকটি, ঘুম ঘুম চোখে যা দেখেছে তা নিশ্চিত কিনা যাচাই করতে এসেছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে বস্তাটার একদম কাছে থেকে দেখতে শুরু করে, বস্তা থেকে বেরিয়ে এসেছে ফ্যাকাসে পা দুটো!

লোকটির আর বুঝতে বাকি রইল না ভেতরে কী আছে, ক্ষণিকের জন্য থমকে গেল সে। তার চোখ দুটি বড় বড় হয়ে কোটর ঠিকরে বের হয়ে আসতে চাচ্ছে। তারপর ছুটে পালিয়ে গেল জায়গাটা থেকে।

একটু পরই পুলিশের একটি জিপ এসে সে জায়গা বরাবর থামল। গাড়ি থেকে কয়েকজন কন্সট্যাবল নামল।

সকালের মিষ্টি রোদের মাঝে লাশটাকে ঘিরে মানুষজন জমতে শুরু করেছে। এরই মাঝে গাড়ি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে এক সাংবাদিক। সে লাশটা দেখেই কয়েকটা ফোন করল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে জায়গাটায় জমে গেল শ-খানেক মানুষ। মফস্বল শহরে এ রকম ঘটনা কালভদ্রে দু-একবার ঘটে। তাই এ ঘটনা শহরের কেউই দেখার সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না। এরপর যারা দেখেনি তাদের কাছে বলবে রগরগে বর্ণনা। কেউ কেউ রূপকথার মতো পরবর্তী প্রজন্মের কাছেও ছড়িয়ে দেবে এই গল্প। শ-খানেক লোকের সাথে আরও কিছু পুলিশও যোগ হয়েছে। মানুষ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে তারা। উৎসুক জনগণের প্রত্যকেই লাশটাকে একনজর দেখতে চায়।

সময়ের সাথে সাথে বড় বড় সব খবরের চ্যানেলের সাংবাদিকদের সংখ্যা বাড়ছে। তাদেরকে দেখা যাচ্ছে যার যার ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে রিপোর্ট করতে।

অবশেষে কোনো এক উর্ধ্বতন তদন্ত অফিসার এসে থামল গাড়ি করে। কিছুক্ষণ দেখে লাশটাকে পাঠিয়ে দিলো মর্গের উদ্দেশ্যে।

দূরে দাঁড়িয়ে *সমুদ্র টিভির* এক তরুণ রিপোর্টার। আকাশি একটা শার্ট ইন করে পরে আছে। তার হাতে ধরা কালো একটা মাইক। ক্যামেরা সামনে রেখে বলছে—

'আজ যে নারীর লাশ পাওয়া গেল, এই খুনটি কি আসলেই কোনো সাধারণ খুন না কি সেই সিক্স মান্থ সিরিয়াল কিলারের আরেকটি শিকার? যদি হয়ে থাকে তবে আর কতদিন চলবে এভাবে? আর কত লাশ পড়লে পরে প্রশাসনের হুঁশ ফিরবে? পুলিশের নাকের ডগায় প্রতি ছ-মাস পর

প্রাণ হারাতে হচ্ছে কোনো এক নারীকে। আজ সারা দেশের নারীরা প্রচণ্ড রকম নিরাপত্তাহীনতায় দিন যাপন করছে। আপনার মা-বোন কিংবা স্ত্রী যেকেউ হতে পারে এই খুনির পরবর্তী শিকার। আর কতদিন তদন্তের নামে তালবাহানা করবে প্রশাসন? কবে ঘুম ভাঙবে তাদের? এর শেষ কোথায়?'

দূরে এক তদন্ত কর্মকর্তা দিশাহীনভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। ওপরের স্যারকে এবার সে কী জবাব দেবে তা ভেবে কুল পাচ্ছে না। অনেক লম্বা সময় নিয়েও চুল পরিমাণ অগ্রগতি হয়নি। এবার এই কেস তার হাত থেকে তো যাবেই। কোথায় না কোথায় বদলি করে দেবেন নিয়াজ মোরশেদ স্যার। আল্লাহই জানেন।

এক

ইউনিভার্সিটির ক্লাসরুম।

ক্লাসে দাঁড়িয়ে লেকচার দিচ্ছেন একজন শিক্ষক। নাম রফিক উদ্দীন। বয়স ত্রিশের আশপাশে হবে, বয়সের তুলনায় তরুণ দেখতে, হাস্যোজ্জ্বল চেহারা। নেভি ব্লু শার্টটি ইন করে পরা। কিছুদিন আগেই বিদেশ থেকে পিএইচডি করে ফিরেছেন, মজা করে ক্লাসও নিতে জানেন; তাই সবার মনোযোগও স্বাভাবিকভাবে একটু বেশি, মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে সবাই। মনোযোগের কথা বলতে গেলে ছেলেদের থেকে মেয়েরা অনেক বেশি এগিয়ে, স্যারের বলা হালকা জোকসগুলোয়ও মোমের মতো গলে পড়ছে তারা। স্যারের গালে যে অল্প হাসিতে একটা টোল পড়ে সেটাও লক্ষ করেছে, ক্লাস শেষে এ নিয়ে রসালো আলোচনাও হবে। আলোচনা হবে স্যার কার দিকে কয়বার তাকিয়েছে তা নিয়েও।

ক্লাসরুমের শেষদিকে জানালার পাশে বসে আছে ফারহান। মাঝারি থেকে একটু লম্বা, কাঠির মতো লিকলিকে শরীর, কোঁকড়ানো ঘন কালো চুল। মুখে ঠাঁই পেয়েছে অনেকদিনের জমানো দাড়ি-গোঁফ। ক্লাসের কোনো আলোচনাই তার কানে যাচ্ছে বলে মনে হয় না; দলছুট পাখির মতো ক্লাস থেকেও বিচ্ছিন্ন। মাথা নিচু করে একমনে বাইরে তাকিয়ে আছে। দোতলার ক্লাসরুম থেকে সামনের সবুজ পান্নার মতো মাঠটি দেখা যাচ্ছে। সেখানে কয়েকটি কালো-খয়েরি রঙের শালিক লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে আর কিচিরমিচির করে ডাকছে। হঠাৎ পাশ থেকে কেউ একটা খোঁচা দিলো; ফারহান ঘুরে তাকাল, পাশেই আরিফ। তাকানোর সাথে সাথে আরিফ তাকে একটি কাগজ ধরিয়ে দিয়ে দূরে বসা নীলার দিকে ইশারা করল।

'হ্যাঁ।'

'হ্যাঁ। বাবা আর নেই।'

'আচ্ছা আমি আসছি।'

ফোন রাখে ফারহান। এরপর দ্রুত বাথরুমে গিয়ে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে জ্যাকেট গায়ে বাসার দেখভাল করেন যে খালা, তাকে ফোন দিয়ে কী কাজ করতে হবে সেটা বলে বেরিয়ে পড়ে।

বাইরে প্রচুর কুয়াশা, হাত-পা কাঁপুনি ধরে যাচ্ছে। জানুয়ারি মাসের শীত বলে কথা। গেট থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটার পর একটা রিকশা পেল, দ্রুত চেপে বসল। রিকশা ধীর গতিতে চলছে, রিকশাওয়ালার পরনে একটা বাদামি রঙের জ্যাকেট আর মাথায় খয়েরি মাফলার।

যেতে যেতে ভাবছে ফারহান, কালকেই নীলা দূতের কাছে এসব বলছিল আর আজকেই তার বাবা সুইসাইড করল। নাহ; বিষয়াটা তো ভালো ঠেকছে না।

নীলার বাড়ি পৌঁছতেই সে গেটের বাইরে প্রদীপকে দেখতে পায় ওর জন্য অপেক্ষা করছে।

'দেখেছিস?'

'হ্যাঁ।'

মাথা নাড়ল প্রদীপ।

দুজন দুজনের দিকে হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এই তাকিয়ে থাকার ইশারা শুধু ওরা নিজেরাই বুঝতে পারে।

ভেতরে গেল। এই সাতসকালেও প্রচুর মানুষ ভিড় করেছে। লাশ নামানো হয়েছে। নীলার মা-কে দেখা গেল অঝোরে কান্না করছে। নীলা চুপচাপ বসে আছে সোফার এক কোনায়। তাদের সাথে চোখাচোখি হলো

একবার। ওকে দেখে মনে হচ্ছে না ওর বাবা মারা গিয়েছে; বরং মনে হচ্ছে ও প্রচুর বিরক্ত। একবার হাইও তুলল। বাবার প্রতি তীব্র ঘৃণার জন্য না কি নেশায় আসক্ত মানুষের আচরণ এমনই হয় কে জানে!

ফারহান একজন লোককে দেখে সুযোগমতো জিজ্ঞেস করল,

'কী হয়েছে জানেন?'

লোকটির বয়স নীলার বাবার বয়সি। সম্ভবত আশপাশের কোনো বাড়িতে থাকে। প্রথমে ফারহান আর প্রদীপের দিকে আঁড়চোখে তাকাল; এরপর বলল,

'রাতে নাকি একসাথেই ঘুমাইছিল, কখন নীলার বাবা বিছানা থেকে উঠে গেছে সেটা নীলার মা জানে না। প্রায় পাঁচটার দিকে যখন নামাজের জন্য উঠেছে তখন দেখে ড্রয়িংরুমে ফ্যানের সাথে লাশ ঝুলছে।'

***

ধূসর রঙের গেটটির বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন ইরফান খন্দকার। নিজের করা দোতলা বাড়িটিকে ভালো করে দেখে নিচ্ছেন। অনেক দিনের অবহেলায় ফেলে রাখা জরাজীর্ণ বাড়িটি এখন সম্পূর্ণ নির্জন দেখাচ্ছে। সাদা রঙের জায়গায় জায়গায় কালো রঙের ছোপ। সবুজ শ্যাওলাও দেখা যাচ্ছে। চিরচেনা বাড়িটি আজ বড্ড অচেনা লাগছে। দীর্ঘদিন পর কোনো মানুষের সাথে দেখা হলে যেমন হয় ঠিক তেমন। গেটটি ঠেলে ঢুকে গেলেন। সোজা বাড়ির ভেতরে ঢুকে উঠে গেলেন দোতলায়। দোতলায় একটি তালা ঝুলছে, এত সকালে ফারহান বাসায় নেই! ওর সাথে মোবাইল নেই। কিছু করার না পেয়ে তিনি বসে রইলেন ছাদে যাওয়ার সিঁড়িতে।

কিছুক্ষণ পর সিঁড়ি দিয়ে কারও উঠে আসার শব্দ পেলেন ইরফান খন্দকার। তিনি বসেই রইলেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই দেখা গেল, একজন

প্রকাশক হাসলেন।

'ভাই চিন্তা করতে হবে না, যে করে হোক আপনাকে এবার মানুষের কাছে পৌঁছে দেবোই। কোনো চিন্তা করবেন না আপনি। আর কখনো হতাশ হতে হবে না আপনাকে।'

ইরফান খন্দকার আবার হাসলেন। তার ঘন কালো গোঁফের নিচে ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে।

'আর হতাশ হব না ভাই সাহেব।'

অদ্ভুত এক আত্মবিশ্বাস দেখা গেল ইরফান খন্দকারের চোখেমুখে।

****

৪ মাস পর...

রাত এগারোটা বেজে ত্রিশ মিনিট।

মফস্বল শহরে অনেক আগেই রাত গভীর হয়ে যায়, কাজ না থাকলে সাধারণত কেউ বের হয় না। রাস্তার পাশের সোডিয়াম লাইটের আলোয় হেঁটে যাচ্ছে একজন মহিলা; বয়স ত্রিশের কোঠায়, নাম সেলিনা আক্তার। সোডিয়ামের আলোয় তার গাঢ় নীল রঙের শাড়ির রঙ বদলে গেছে। দ্রুত পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন তিনি; আজ অফিস শেষে এক কলিগের বাড়ি গিয়েছিলেন, তার ছোট মেয়েটার জন্মদিনের অনুষ্ঠান ছিল। কথা বলতে বলতে কখন যে দেরি হয়ে গিয়েছে টের পায়নি। বেরিয়ে আসার পর বাসায় যাওয়ার জন্য যখন সিএনজি বা রিকশা খোঁজার চেষ্টা করছেন তখন কিছুই পাওয়া যাচ্ছিল না। ভেবেছিলেন একটু হাঁটলেই পেয়ে যাবেন; কিন্তু সেই কতক্ষণ যাবৎ হাঁটছেন কিন্তু কোনো রিকশা বা সিএনজি কিছুই পাওয়া যায়নি তখনও। আকাশও অন্ধকার হয়ে এসেছে, গুরুম গুরুম শব্দে মেঘেরা তাদের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। সেলিনা আক্তার একটু শব্দতেই